টিটেনাস টক্সাইড

শান্তনু ঘোষ

ভোরবেলা ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল। মাথাটা বেশ ভারী লাগছে। গড়িতে প্রায় পৌনে ছটা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল অর্জুন গায়ে পাতলা চাদরটা জড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। অবশ্য ছটা বাজেনি এখনো। ভোরের দিকটায় এখনো একটা ঠাণ্ডা ভাব রয়েছে। জানলা খোলা থাকলে ফ্যানটা বন্ধ করতে হয়। বাড়ির সামনের রাস্তাটাই হল এখানকার বাজারে যাবার পথ। হেঁটে পাঁচ - ছয় মিনিট। অনেকেই মর্নিং - ওয়াকে বেরিয়েছে--- ইদানিং মানুষ খুব স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠছে। আকাশটা ঘোলাটে হয়ে আছে, এখনো রোদ্দুর ওঠেনি। দেখা স্বপ্নগুলো কি রকম জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথায় ভেতরে। সারারাত ধরে দেখে স্বপ্নগুলো ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে---আলাদা করে কোনটার মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবগুলো মিলে কোলাজ হয়ে যাচ্ছে। কাল সকালের ঘটনাটামনে পড়ে গেল অর্জুনের। সকালে অফিস যাবার সময় সাইকেলে যাচ্ছে, দেখল তণ সঙেঘর মাঠে চারটে বড় পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে। জায়গাটা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। অবাক হল সে, এখানে এত পুলিশ কেন! পাশেই পঞ্চাননতলায় পরপর সাইকেল স্ট্যান্ড, তারই একটাতে সাইকেল রাখে সে, তারপর কয়েক পা হেঁটে জি. টি. রোডে বাস বা অটো ধরে।

সাইকেল রাখতে গিয়ে অর্জুন খোকনদার কাছ থেকে জানতে পারল যে ব্রীজ তৈরীর জন্য সরকারি নোটিশ পেয়ে সবাই বাড়ি ছেড়ে দিলেও অবণীবাবু ছাড়েননি। আর তাঁকে উচ্ছেদ করতেই এই বিশাল বাহিনী। পাশেই নদীর ওপর ব্রীজ হবে--- আর তাই প্রায় এক বছর আগেই এই জায়গায় প্রায় সত্তরটা পরিবারকে বাড়ি ছেড়ে যাবার নোটিশ জারি করা হয়। সবাই ক্ষতিপূরণ নিয়ে উঠে গেছে বহুদিন হল। কিন্তু অবণীবাবু ক্ষতিপূরণও নেননি, বাড়িও ছাড়েননি। খোকনদা বলল যে নিতান্ত নির্বোধ না হলে কেউ ওরকম করে! ক্ষতিপূরণ যা দিয়েছে প্রত্যেককে বাড়িবেচে দিলেও অত টাকা তারা পেত না।

অবণীবাবুর বয়স প্রায় সত্তর বছর। হাওড়ার লঞ্চঘাটের কেরাণী ছিলেন। রিটায়ার করেছেন প্রায় ১২-১৩ বছর। মেলামেশা বিশেষ করতেন না কারোর সঙ্গে। নিঃসন্তান অবণীর স্ত্রী অনেকদিন শয্যাশায়ী। এই পৈত্রিক ভিটেতে কোনরকমে খুঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল তাঁর।

অফিসের তাড়ায় সাইকেল রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেল অর্জুন। সারাদিন কাজের চাপে কোন অবকাশ পেল না। সে একটা বড় কর্পোরেট হাউসের দায়িত্বপূর্ণ পদে আছে। বি.ই করার পর সফট্ওয়্যারে শিফট্ করেছে সে। বেশ মোটা মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ পায় অর্জুন।

রাতে ফিরতে প্রায় দশটা বেজে গেল। সাইকেল বের করার সময় অর্জুন প্র করল, 'খোকনদা, অবণীবাবুরা কোথায় গেল?'

---মরে গেল!

---মানে? এসময় খোকনদা একটু মৌজে থাকে। কথা প্রায় বলেই না। তবু বলল---সকালে তো বেলানগরেএকটা ঘর ঠিক করে পাড়ার ছেলেরা পৌঁছে দিল। ম্যাটাডোরে করে জিনিষপত্রও দিয়ে এসেছে সব। তা সন্ধের খানিক পরে, প্রায় আটটা হবে, বুড়ো হাজির আবার। তার বাড়িতো সারাদিনে মাটিতে প্রায় মিশে গেছে। নিজের ভাঙাবাড়ির সামনে গিয়ে ধপাস্

করে বসে পড়ল। তারপরই শুয়ে পড়ল। মোড়ের ছেলেরা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বাঁচবে না!
সাইকেল নিয়ে বেরোতে গিয়ে শুনতে পেল খোকনদার স্বগতোক্তি---সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি---এরপর বক্‌বক্‌ করে নেশাটা দিল ফরসা করে! রাতের খোকনদার কথা গায়ে না মেখে প্যাডেলে চাপ দিল অর্জুন।
রান্নাঘর থেকে আওয়াজ আসছে। মা চা করছে। সাতটা না বাজলে শিবানীদি আসবে না। জায়গাটা এখন পুরো জেগে উঠেছে। রাস্তায় বাজারের থলে হাতে লোকজন। মা চা নিয়ে এল।
---আচ্ছা মা, অবণীবাবু কি মারা গেলেন? একবার গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব!
---কে?
---আরে, ঐ বাড়ি ভাঙা পড়ল যাদের---অবণীবাবু। কাল রাতে তোমাকে বললাম না? আজকাল তোমার স্মৃতি এত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কেন মা! তোমার শরীরটাও ইদানিং ভালো যাচ্ছে না। একবার ডাক্তার দেখিয়ে সুগার, কোলেস্টেরল, ই.সি.জি সব চেক্‌ আপ করিয়ে নাও।
---অজু, বেলা হয়ে যাচ্ছে, বাজারে যা। শিবানী এসে পড়বে এখনই। আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।
---কি লাগবে বল?
---আলু লাগবে না। বাকি তরিতরকারী দেখেশুনে নিবি। আর মুদিখানা থেকে চিনি, গরমমশলা আনবি। মাছ দুদিনের মতো।
কাগজটা দিয়ে গেছে। হেডলাইন দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল অর্জুনের। মানবতার স্বঘোষিত পূজারী, বুশ ইরাকের সাধারণ মানুষকে সাদ্দামের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে চান। সেই কারণেই বাগদাদ, বসরাহের উপর চলছে বুশ আর তার স্যাঙাত্‌ ব্লেয়ারের বাহিনীর বোমা বর্ষণ। বৃষ্টির মতো অবিরাম ধারায় পড়ছে বোম্‌। তারই টাটকা ছবি কাগজের সামনের পাতায়। ভিতরের পাতায় এডিটোরিয়াল।
কয়েকদিন পরে অফিসে একটি ছেলে এসেছে অর্জুনের কাছে। সাদামাটা পোশাক, দেখেই বোঝা যায়, পেটে শিক্ষাদীক্ষাও প্রায় কিছুই নেই। সে মুখ তুলে তাকাতেই ছেলেটি হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল---স্যার, আপনি যেখানে সাইকেল রাখেন, সেই খোকনদা আমাকে পাঠাল। অবণীবাবু আমার মেশোমশাই। বেলানগরে আমাদের বাড়ি। মাসিমাকে আমরাই এখন দেখছি। আমাদের অবস্থা তো বুঝতে পারছেন! ওরকম অসুস্থ মাসি, তার ওষুধের খরচও অনেক। যদি একটা পিয়ন-টিয়নের চাকরী করে দেন। আপনার তো অনেক ক্ষমতা, চেনাজানাও প্রচুর।
কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল অর্জুন। মনের ভেতরে রাগও হল। খোকনদা ওকে এখানে পাঠাতে গেল কেন? তারপর ভাবল, মানুষ বিপদে পড়েই তো এসেছে। ছেলেটাকে সে বলল, তুমি দুদিন পরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবে। তবে এখানে নয়, সকালের দিকে বাড়িতে আসবে। ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।
অর্জুন চিন্তা করল আজ সন্ধেতে তার তনয়ার বাড়িতে যাবার কথা আছে। কয়েকদিন দেখা হয়নি তাদের। তনয়া একটা সেমিনারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, দু - তিন দিন ফোন করে বারবার যেতে বলছে ওদের বাড়িতে। অর্জুন ভাবল ওখানে গিয়ে তনয়ার বাবাকে বলবে ছেলেটার কথা। ওনার এতবড় ব্যবসাতে ঠিক কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে দেবেন ছেলেটাকে।
তনয়াকে ঘটনাটা বলাতে সে বলল, 'তোমার মাথাটা একেবারে গেছে! সকলের দুরবস্থার দায় কি তোমার! তুমি এসব বাবাকে বলবে না যেন।'

অর্জুনের জন্মের দুমাস আগেই তার বাবা মারা যান একটা পথ দুর্ঘটনায়। মায়ের বিবাহিত জীবনের আয়ু ছিল এক বছর চার মাস। আর্থিক কোনো অনটন মায়ের ছিল না। বাবার ব্যাঙ্কে চাকুরীও পায় মা, কিন্তু একাকিত্ব! মা সারাট জীবনই বড় একা। বাবা মারা যাবার পর জ্যাঠামশাই মাকে তাঁর সংসারে থাকার কথা বলেছিলেন, কিন্তু মারাজী হয়নি। বাপের বাড়িতে নিঃসন্তান বড়দার কাছে চলে গেছিল। অবশ্য বছর দশেক আগে মা এই ফ্ল্যাটটা কিনে, এখানে চলে আসে। বোধহয় অভিমানেই, অন্য মামিমারা অনেকেই আড়ালে বলছে যে অর্জুনই বড় মামার উত্তরাধিকারী ---এটা শোনার পরই মা এই ফ্ল্যাটটা কেনে।

অর্জুন জানে যে তার মায়েৰ জীবনের সুখ - দুঃখ তাকে ঘিরেই আবর্তন করে। তাই সেও চেষ্টা করে তার মানসিক অশান্তির খবর মাকে না জানাতে। তবে সেদিন খেতে বসে অর্জুন তার মা - কে বলল ---ভাবছি এই চাকরীটা আর করব না।
---কেন?
---ভালো লাগছে না।
---বেটার কোন অফার পেলি?
---না।
---তাহলে কেউ হুট করে এত ভালো চাকরী ছাড়ার কথা ভাবে।
---দেখ মা, এই চাকরীটার আমার কোনো দরকার নেই, চারিদিকে এত বেকার। এত গরীব, না খেতে পাওয়া মানুষ---আমি এত টাকা দিয়ে কি করব মা! যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা কর আমার একটা ক্লার্কের চাকরী হলেই চলে যাবে।
---তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে যে এত প্রলাপ বকছিস্! একজন সফট্ওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হবে ক্লার্ক!। এই আমার স্বপ্ন ছিল! এই শোনার জন্য সারা জীবন পাত করলাম।
---মা, দুঃখ পেয়ো না। আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর।
অর্জুনের মা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন। অর্জুনেরও মনটা বিগড়ে গেল। ভেবেছিল মা অন্তত তাকে বুঝবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়েও অফিস গেল না অর্জুন। এখান থেকে খানিকটা দূরেই গঙ্গা। লাইব্রেরির ঘাটে গিয়ে বসল সে। বহুবছর ধরে মনখারাপের সময় এখানে আসে। এখন চারদিক ফাঁকা। গাছের নিচে বেদিতে বসল অর্জুন। নদীটা দূরে বাঁক নিয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায়---তার ওপাশেও নদীটা আছে। যা দেখা যায় সেটাই তো জগৎ নয়। বেশীর ভাগই তো দৃশ্যের অতীত। বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তার চিন্তা! এখানে বসলেই অর্জুনের ভীষণভাবে মনে পড়ে ছেলেবেলায় গল্পে পড়া ‘নালকের কথা’, কাছেই কোথাও বুদ্ধদেব এসেছেন, রাখাল বালক নালক যেতে পারছে না বুদ্ধদেবকে দেখতে। তাই বুদ্ধের উদ্দেশ্য নালক ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছে নদীতে।
সন্ধের পর বাড়ি ফিলে দেখল মা খানিক আগেই ফিরেছে। চুপ করে বসে আছে। অর্জুন জুতো খুলে ঘরে ঢুকতেই বলল---‘ম্যানেজার ফোন করেছিলেন।’
পরের দিনও অফিস গেল না অর্জুন, ভালো লাগল না। বিকেলে পাড়ায় আড্ডা দিতে বেরোল। সেখানেও বেশীক্ষণ ভালো লাগল না, বাড়ি ফিরে দেখল ছোটমামা বসে আছে।
---ছোটমামা কেমন আছো? মামিমারা সবাই ভালো আছে? একা এলে কেন?
---আমরা সবাই ভাল আছি, কিন্তু তোর এ কি পাগলামো বলতো! নিজের কথা না হয় ভাবলি না! কিন্তু মায়ের দায়িত্ব তো! মায়েরও তো বয়স হচ্ছে। তুই জানিস না যে তোর এসব খামখেয়ালীপনা তোর মায়ের উপর কিরকম চাপ তৈরী করে? তার কি অধিকার আছে মাকে এরকমভাবে কষ্ট দেবার! শোন্, তুই একটা ক্লার্ক বা পিয়নের চাকরী নিলেই কি দেশের সব সমস্যা মিটে যাবে?
মানুষের দুঃখ - কষ্টের শেষ হবে? এভাবে কিছু হয় ? এসব পাগলামি ছাড়। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিস না।

একটু বাদেই ছোটমাসির ফোন। সেই একই কথা, অভিযোগ, আমি মায়ের দিকটা দেখছি না। ছোটমামারপরামর্শেই বোধহয় মা এক সাইক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল। মনে রাগ হল প্রচণ্ড। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে যেতে হল অর্জুনকে।
সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন যে এটা একটা অসুখ। কোনক্ষেত্রে এর নাম‘দুঃখবিলাসিতা’ আর কোন ক্ষেত্রে এর নাম ‘লোকহিতৈষণা’। একসময় এটা খুব কমন অসুখ ছিল। বহু লোক এই রোগে ভুগত আর অপরিসীম কষ্টপেত। এখন অবশ্য এর প্রকোপ অনেক কমে এসেছে। আসলে সমাজতন্ত্র বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেল। সবাই এখন দৌড়াচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দিকে। সমাজতন্ত্রের নামাবলীটা গায়ে তুললেই কিন্তু এই অসুখ আবার বাড়বে।
প্রৌঢ় ডাক্তারের এইসব কথা মায়ের ভালো লাগছে না, সেটা অর্জুন বুঝতে পারছে। তার কিন্তু বেশ লাগছে। মা প্র করল

--- সারবে তো ডাক্তারবাবু!
পাশের ঘরে অর্জুনকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। নানারকম মেশিন চালিয়ে এবং নানা রকম আলো জ্বালিয়ে দিলেন। ঘরে একটা মায়াময় পরিস্থিতি, একটা আরামদায়ক অনুভূতি। ডাক্তারবাবু বলতে থাকলেন---তুমি তো মহান ব্যক্তি হে! এটা তো বিবেকানন্দ-চৈতন্য সিন্ড্রোম! রোগটা পাকালে কি করে? আর কিছুদিন দেরী করলেই শু হয়ে যেত টিটেনাস। তারপর বহু প্রশ্ন, বহু কথা...। ঠিক মনে নেই অর্জুনের।
পরে ডাক্তারবাবু মা'কে বললেন---চিন্তার কিছু নেই। সারিয়ে দেব। প্রেসক্রিপশানটা ঠিক মতো ফলো করবেন। কিছুদিন স্ট্রেইন না নেওয়াই ভালো। তার এক মাস পরে রির্পোট দেবেন।
ডাক্তারবাবুর ওষুধ খেয়ে নিজেকে অনেক ফুরফুরে লাগল। অর্জুন বুঝল অসুস্থ না হলেও একটা শারীরিক ক্লান্তি ছিল। রাতে মা'কে বলল---আর আমি অফিস কামাই করতে পারব না তাহলে সামনের ফরেন ট্যুরটা নাও পেতে পারি। অনেক কম্পিটিটার...।

আজ অনেকদিন পরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে অর্জুন। পিসতুতো দিদি - জামাইবাবু আসবেন, তাই তনয়া ফোন করেছিল অফিসে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে রিক্সায় উঠল অর্জুন। সাইকেল স্ট্যান্ডের সামনে উল্টোদিক থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স আসায় রিক্সাটা পাশ করে দাঁড়াল। তাকে দেখে খোকনদা হেসে বলল---ভালো আছেন? খবর সব ভালোতো! পরশুতো অবণীবাবুর স্ত্রী মারা গেলেন। শেষ সময়টা যে ভাবে কাটল!
একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল অর্জুন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ব্রীজের উপর গাড়ির সারি। সবে সন্ধে নামছে। গাড়িগুলোর সব হেডলাইট জ্বলছে, এরই নিচে কোথাও একটা বাড়ি ছিল ভদ্রলোকদের।.....

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com